শিশুবিষয়ক সংবাদের
বোধগম্যতা এবং নীতি-নৈতিকতা

শিশুবিষয়ক সংবাদের
বোধগম্যতা এবং নীতি-নৈতিকতা

© ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১৬

ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ
৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (৪র্থ তলা), ব্লক-এ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : +৮৮-০২-৯১৩৪৭১৭, +৮৮-০২-৯১৩৭১৪৭
ই-মেইল : info@mrdibd.org
ওয়েবসাইট : www.mrdibd.org

ভূমিকা

গত দুই দশকে বাংলাদেশে গণমাধ্যমের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সংবাদপত্রের সংখ্যা বেড়েছে, নিত্য নতুন বেসরকারি টেলিভিশন, রেডিওর জন্ম হয়েছে, আরো বেসরকারি টেলিভিশন, রেডিও লাইসেন্স পেয়েছে বা সম্প্রচার শুরু করার অপেক্ষায় আছে। এ ছাড়া রয়েছে অগণিত অনলাইন সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থা।

সংখ্যায় বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্বাভাবিকভাবেই রিপোর্টের সংখ্যাও বাড়ছে। গণমাধ্যমের মধ্যে কে কার আগে প্রথমেই গুরুত্বপূর্ণ (কখনো বা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়) সংবাদটি পরিবেশন করবে, সেই প্রতিযোগিতাও তীব্র হয়েছে। তাই এই প্রতিযোগিতার ভিড়ে পাঠক/শ্রোতা কতটা সঠিক ও মানসম্মত সংবাদ পাচ্ছে এবং সংবাদ প্রচার/প্রকাশে মানুষ ও সমাজের ওপর তার প্রভাব বিষয়ে গণমাধ্যম কতটা দায়িত্বশীল ছিল, এই বিষয়গুলো জানা বা বুঝতে পারাটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, কেননা সংবাদের মূল প্রাণ হচ্ছে পাঠক/শ্রোতা। তারাই কোনো-না-কোনোভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংবাদের সঙ্গে জড়িত থাকে।

এই পাঠক/শ্রোতার একটি বড় অংশ হচ্ছে শিশু বা কিশোর। তারা কখনো কখনো প্রত্যক্ষভাবে নিয়মিত পত্রিকা পড়ে, টিভি দেখে এবং অনলাইনের মাধ্যমে সংবাদ পড়ে বা দেখে থাকে। তাই শিশুকে নিয়ে বা শিশুবিষয়ক সংবাদ তৈরি ও প্রচার/প্রকাশের ক্ষেত্রে নীতি-নৈতিকতার প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কেননা যেকোনো সংবাদ বা ছবি দেখে শিশু মনে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। তাই সংবাদ প্রচার/প্রকাশে শিশুর ওপর যাতে বিরূপ প্রভাব না পড়ে, সে বিষয়ের প্রতি গণমাধ্যমের পাশাপাশি পাঠক/শ্রোতাদের ও সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কেননা সংবাদপত্র বা টিভিতে শিশুদের স্বার্থপরিপন্থি কোনো সংবাদ বা ছবি প্রচার/প্রকাশ করলে পাঠক/শ্রোতারা যদি বুঝতে পারে যে এখানে নীতি-নৈতিকতার লঙ্ঘন হয়েছে, তাহলে তারা ওই মিডিয়াকে জবাবদিহির আওতায় আনতে পারবে এবং গণমাধ্যম যেকোনো সংবাদ প্রচার/প্রকাশে সতর্কতা অবলম্বন করবে। তাই যেকোনো সংবাদ প্রচারে, বিশেষ করে নীতি-নৈতিকতা মেনে শিশুসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রচার/প্রকাশে পাঠক/শ্রোতার সংবাদ জ্ঞান থাকাটা খুবই জরুরি।

কিশোর বা তরুণ বয়স যেকোনো বিষয়ের ভালো-মন্দ বুঝতে পারা, অর্থাৎ– জীবনের নৈতিক দিক বুঝতে পারার শ্রেষ্ঠ সময়। এই অল্পবয়সি বা তরুণ ছেলেমেয়েরাই বিভিন্ন

সময় খবরের পাঠক/শ্রোতা এবং খবরের কেন্দ্রে থাকে। তাই কিশোর/তরুণ পাঠকদের সংবাদ সম্পর্কে নিজেদের বোধগম্যতা বাড়ানো বা সংবাদ সম্পর্কে সচেতন করা প্রয়োজন। কিশোর/তরুণদের একটি বড় অংশ বিতর্কের যুক্তিতর্কের মাধ্যমে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমাধানের চেষ্টা করেন এবং মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করেন। তাই নীতি-নৈতিকতা মেনে শিশুদের জন্য প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে পাঠক হিসেবে তাদের সচেতন করার লক্ষ্যেই এই বিতর্কের আয়োজন। তারা যাতে শিক্ষিত এবং সচেতন পাঠক হিসেবে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে সংবাদের ভালো মন্দ দিক বুঝতে পারেন এবং শিশুসংক্রান্ত প্রতিবেদনে নীতি-নৈতিকতার লঙ্ঘন হয়েছে কি না, এটা উপলব্ধি করতে পারেন। এই বোধ থেকেই বিতর্কের এই যুক্তিবাদী/মুক্তমনা মানুষগুলো গণমাধ্যমের নীতি-নৈতিকতা লঙ্ঘনের চিত্র নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করতে পারবেন এবং সমাজে সচেতনতা তৈরি করতে পারবেন।

এ উদ্দেশ্য নিয়েই এমআরডিআই ইউনিসেফের সহায়তায় 'Exploring young Mind: News literacy and ethics in child reporting' নামে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যার অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে বিতর্কের মাধ্যমে স্কুল এবং কলেজের যুক্তিবাদী মুক্তমনা কিশোর/তরুণদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে সচেতনতা তৈরি করা।

তাই বিতার্কিকদের আলোচনার সুবিধার্থে গণমাধ্যমের (পত্রিকা ও টেলিভিশনের) নীতি-নৈতিকতা লঙ্ঘনের কিছু চিত্র এবং বাংলাদেশে বিদ্যমান প্রাসঙ্গিক জাতীয় আইনসমূহের ও জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের (শিশুদের স্বার্থসংক্রান্ত) কিছু অংশ এই বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। যা বিতার্কিকদের তথ্য প্রাপ্তির উৎস হিসেবে সহায়ক হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের জানার পরিধি বিস্তৃত করবে।

আমাদের এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমর্থন এবং সহযোগিতা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ডিবেট ফেডারেশন (বিডিএফ)-এর প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ ছাড়াও এই কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা করার জন্য ইউনিসেফ বাংলাদেশের কাছে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এ কাজের সঙ্গে যুক্ত এমআরডিআই-এর কর্মীদের।

সংবাদ সম্পর্কে নিজের বোধগম্যতা এবং শিশুবিষয়ক প্রতিবেদনে নীতি-নৈতিকতা

প্রতিদিন গণমাধ্যমে যে খবর/ছবি প্রচারিত হচ্ছে তার মূল বিচারক হচ্ছে পাঠক বা শ্রোতা। তাই খবরের/ছবির বিভিন্ন উপাদানের গুণগত মান বিচার-বিশ্লেষণ করার দায়িত্ব পাঠক/শ্রোতাদেরই। যেমন– খবরের সত্যতা বা বিশ্বাসযোগ্যতা আছে কি না, খবরটি রুচিসম্মত কি না, নীতি-নৈতিকতার মানদণ্ড বিবেচনা করে করা হয়েছে কি না এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কারো স্বার্থহানি বা স্বার্থ হাসিলের জন্য করা হয়েছে কি না ইত্যাদি। আর এভাবেই গণমাধ্যম তাদের প্রতিদিনের কাজের জন্য পাঠকের নিকট দায়বদ্ধ থাকে ও জবাবদিহি করে।

বর্তমান সময়ে পাঠক/শ্রোতার একটি বড় অংশ হচ্ছে শিশু এবং কিশোর, যারা বিভিন্নভাবে গণমাধ্যমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছে। তাই সংবাদ প্রচার/প্রকাশে শিশুদের মানসিক বিকাশের অন্তরায় হচ্ছে কি না এবং ভাষার ব্যবহারে রুচিসম্মত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে কি না– এ বিষয়টি বিবেচনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা গণমাধ্যমের মূল আদালত হচ্ছে পাঠক/শ্রোতা। তাই পাঠক/শ্রোতার যদি সংবাদ সম্পর্কে জ্ঞান থাকে এবং তারা যদি ভালো-মন্দ কাজের বিচার করতে পারেন, তাহলেই গণমাধ্যমের কাজের জবাবদিহি বৃদ্ধি পাবে এবং পাঠক সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পাবে। তাই পাঠকের নিউজ লিটারেসি বা সংবাদবোধ থাকাটা জরুরি।

নিউজ লিটারেসি বা সংবাদ সম্পর্কে নিজের বোধগম্যতা হচ্ছে পাঠক/শ্রোতার মধ্যে তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা বিশ্লেষণ করার শক্তি, অর্থাৎ– যেকোনো বিষয়ে নিজের বিচার-বুদ্ধি-বিবেচনা করে তার বিশ্বাসযোগ্যতা অনুধাবন করতে পারা বা সংবাদের ভালো-মন্দ দিক বিবেচনা করে সংবাদের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারা। একজন পাঠক/শ্রোতার এই বিশ্লেষণ করতে পারার দক্ষতা থাকলেই সে বুঝতে পারবে কোন সংবাদ প্রচার/প্রকাশ করা উচিত আর কোন সংবাদ প্রচার/প্রকাশ করা উচিত নয়। আর প্রচার/প্রকাশ করলেও কীভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। পাঠক/শ্রোতা হিসেবে আমাদের যদি সংবাদ সম্পর্কে ধারণা থাকে এবং সংবাদের সমালোচনা করতে পারি, তাহলে গণমাধ্যমগুলো আরো সতর্কতার সঙ্গে সংবাদ প্রচার/প্রকাশ করবে। কারো স্বার্থ হাসিলের জন্য নয় বা ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতির জন্য নয় বরং জনগণের কল্যাণে সংবাদ প্রচার/প্রকাশে উদ্বুদ্ধ হবে।

আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের চারপাশের বিভিন্ন খবর পত্রিকা বা অনলাইনের মাধ্যমে জানতে পারি এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে দেখি। এই খবরগুলো পড়ে বা দেখে পাঠক/শ্রোতা হিসেবে আমাদের মনে খবরের উৎস, সত্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন জাগতে পারে। আবার কোনো সংবাদ পড়ে বা দেখে মনে হতে পারে, সংবাদটি প্রচার/প্রকাশ করা ঠিক হয়নি, বা এটাকে অন্যভাবে প্রচার/প্রকাশ করা যেত। এই যে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারা, এটাই হচ্ছে নিউজ লিটারেসি বা সংবাদ বোঝার ক্ষমতা।

যেমন : উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি, সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনী নিহত হওয়ার পর অনেক টিভি চ্যানেল, পত্রিকা এবং অনলাইনে তাদের পাঁচ বছরের ছেলের ছবি ব্যবহার করেছে এবং তার সাক্ষাৎকার নিয়েছে। পরবর্তী সময়ে এটা নিয়ে পাঠকের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেছে যে এটা আদৌ ঠিক হয়েছে কি না বা এর প্রয়োজনীয়তা ছিল কি না। এই যে পাঠক/শ্রোতার ভালো-মন্দ বিচার করতে পারার সক্ষমতা বা গণমাধ্যমের কাজের সমালোচনা করতে পারা, এটাই নিউজ লিটারেসি।

বর্তমানের এই তথ্যপ্রযুক্তির যুগে তরুণ ছাত্রসমাজ এ ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে তাদের সংবাদবোধ বাড়াতে পারে। যেমন– কোনো সংবাদ নিয়ে তার মধ্যে কোন প্রশ্ন তৈরি হলে সে সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তি ব্যবহার করে সংবাদের সত্যতা যাচাই করতে পারে এবং কেনো সংবাদ পাঠ করে/দেখে তার যদি মনে হয় যে এই সংবাদ প্রচার/প্রকাশ করা ঠিক হয়নি, তাহলে সে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে জনমত তৈরি করতে পারে। এতে অন্যরাও বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হবে। তাই তরুণ সমাজকে বিষয়টি নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন। কারণ তরুণরাই জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার।

আমরা বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে দেখতে পাই, গণমাধ্যমে যেসব সংবাদ প্রচারিত হয় তাদের মধ্যে শিশুরা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়, যেখানে শিশুরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংবাদের সংস্পর্শে আসে, কখনো সংবাদের শিরোনাম হিসেবে আবার কখনো সংবাদের পাঠক হিসেবে। তাই যেকোনো সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থ বিবেচনা করে, অর্থাৎ– সংবাদ যেন শিশুর জন্য ক্ষতির কারণ না হয়, সে দিকটা বিবেচনা করে গণমাধ্যমের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন। আর একজন পাঠক/শ্রোতা হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হবে শিশুসংক্রান্ত প্রতিবেদনে শিশুর স্বার্থহানি করা কোনো সংবাদ প্রচার/প্রকাশ করা হয়েছে কি না বা নীতি-নৈতিকতার লঙ্ঘন হয়েছে কি না, সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং পরবর্তী সময়ে জনমত তৈরি করে গণমাধ্যমকে জবাবদিহির আওতায় আনা, যাতে তারা ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রতিবেদন প্রচার/প্রকাশে সাবধানতা অবলম্বন করে।

তাই প্রথমেই আমাদের জানা প্রয়োজন শিশু কে এবং সংবাদে শিশু কেন গুরুত্বপূর্ণ?

শিশু কে?

শিশুর জন্য সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই এই প্রশ্নটি আবশ্যিকভাবে সামনে আসে 'শিশু কে?'

জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ (সিআরসি) অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সি সকলেই শিশু।

বাংলাদেশের জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১-এ ১৮ বছরের কম বয়সি সকল ব্যক্তিকে শিশু বলা হয়েছে। এর মধ্যে ১৪ বছর থেকে ১৮ বছরের কম বয়সি শিশুদের কিশোর-কিশোরী বলা হয়েছে।

শিশু আইন, ২০১৩ শিশু বিষয়ে দেশের প্রধান আইন। এই আইনে বলা হয়েছে, 'বিদ্যমান অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, অনূর্ধ্ব ১৮ (আঠার) বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু হিসাবে গণ্য হইবে।'

সংবাদে শিশু কেন গুরুত্বপূর্ণ?

শিশুকাল হচ্ছে পরিপূর্ণভাবে বেড়ে ওঠার বয়স, শেখার বয়স। নিজের জীবনকে নির্ভাবনায় উপভোগ করা ও নতুন নতুন আগ্রহ-কৌতূহল পরিতৃপ্ত করে বিচিত্র জগৎকে চেনা-বোঝা আস্বাদ করার বয়স। অন্যদিকে, ব্যক্তি হিসেবে শিশু পূর্ণ মর্যাদা দাবি করে। পরিবারে ও সমাজে তার অংশগ্রহণ, স্বার্থ ও অধিকার অগ্রাধিকার বিবেচ্য।

শিশু নিজের স্বার্থ নিজে দেখতে পারে না। নিজের কল্যাণের জন্য সে অন্যের ওপর নির্ভরশীল থাকে। শিশু শারীরিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই দুর্বল ও স্পর্শকাতর। তাই তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি। নির্যাতন, শোষণ বা ক্ষতিকর প্রভাবের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা তার থাকে না। সুতরাং শিশুর কথা আলাদা করে ভাবা দরকার, শিশুর জন্য বিশেষ যত্ন প্রয়োজন। তার শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশের পুরো সুযোগ প্রয়োজন হয়। এটা শিশুর বিশেষ অধিকার। তার এ বিকাশ অল্পতেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে।

আমাদের গণমাধ্যমে শিশুদের নিয়ে রিপোর্টের সংখ্যা বেড়েছে। শিশুরা যেমন অপরাধের শিকার হচ্ছে, তেমনি শিশুরাও অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হচ্ছে ও দোষী সাব্যস্ত হচ্ছে। একই সঙ্গে শিশু পাঠকের সংখ্যাও বাড়ছে। শিশুরা নিয়মিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গণমাধ্যমের সংস্পর্শে আসে। তারা পত্রিকা পড়ে, ছবি দেখে। সংবাদ যেহেতু সচরাচর বড় পাঠকদের মাথায় রেখে তৈরি করা হয়, সেখানে এমন অনেক কিছু থাকতে পারে, যা শিশুর ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। জীবনের উন্মেষপর্বে অনেক কিছুই শিশুর মনে চট করে গভীর ছাপ ফেলতে পারে।

শিশু যখন নিজে ঘটনায় জড়িত থাকে বা ঘটনার সঙ্গে শিশুকে সংশ্লিষ্ট করার প্রয়োজন হয়, তখন সাংবাদিক কীভাবে তাকে এবং তার স্বার্থ দেখেন সেটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর ওপর ওই শিশুর কল্যাণ-অকল্যাণ সরাসরি নির্ভর করে। তাই শিশুদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনায় নীতি-নৈতিকতা মেনে সংবাদ প্রচার/প্রকাশের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন পর্যালোচনায় শিশুবিষয়ক প্রতিবেদনে নীতি-নৈতিকতার লঙ্ঘনের কিছু চিত্র ফুটে উঠেছে, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিশুকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

সংবাদপত্রের কিছু নীতি-নৈতিকতা লঙ্ঘনের চিত্র

জাতীয় একটি পত্রিকার শিরোনামে বলা হয়েছে **'টিভি সিরিয়ালে প্রভাবিত হয়ে নাটোরে সহপাঠী খুন'**। বিদেশি টিভি সিরিয়াল দেখে প্রভাবিত হয়ে নাটোরে ৫ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবিতে মাদ্রাসা ছাত্রকে (১১) হত্যা করেছে তার তিন সহপাঠী। এখানে অভিযুক্ত কিশোরদের নাম, বাবার নাম, ঠিকানা এবং হাতকড়া পড়ানো ছবি দেয়া হয়েছে এবং কীভাবে তারা হত্যার পরিকল্পনা করে ও হত্যা নিশ্চিত করে তার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

আবার অন্য একটি পত্রিকার শিরোনামে বলা হয়েছে– **শ্রীপুরে অন্তঃসত্ত্বা কলেজছাত্রীর গর্ভপাতকালে মৃত্যু**। এরপর সূচনাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মা-বাবার একমাত্র কন্যা শাহীনুরকে ঘিরে ছিল অনেক স্বপ্ন। দরিদ্র মা বাবার ঘাম ঝরানো শ্রমের টাকায় শাহীনুরের পড়ালেখা চলত। মায়ের চোখে একদিন শাহীনুরের অস্বাভাবিক আচরণ প্রকাশ পায়। জানতে চাইলে মায়ের কাছে ঘটনা চেপে যায় সে। তত দিনে শরীরে মাতৃত্বের প্রকাশ ঘটতে শুরু করে। এক পর্যায়ে শাহীনুরের মা জানতে পারেন তার কুমারী কন্যা অন্তঃসত্ত্বা। লোকজনের ভয়ে মা-বাবা কন্যার গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত নেন। শনিবার সকালে গর্ভপাতকালে শাহীনুর মারা যায়।

এরকম আরো কিছু লঙ্ঘনের চিত্র–

'ঘুম ভেঙে দেখি, বাবা মাকে জবাই করতাছে'

'মায়ের চিৎকারে ঘুম থেকে উঠে দেখি বাবা দা দিয়ে মাকে জবাই করতাছে।' থানায় এ কথা বলে কান্নায় ভেঙে পড়ে নয় বছরের মৌসুমি। সোমবার ভোরে পারিবারিক কলহের জেরে স্ত্রীকে দা দিয়ে জবাই করেছে পাষণ্ড স্বামী।

'আড়াই মাসের শিশুকে গলাটিপে হত্যা করল পাষণ্ড পিতা'

প্রাথমিকভাবে হত্যার কারণ উদ্‌ঘাটন হয়নি, তবে ধারণা করা হচ্ছে পরকীয়ার কারণে শিশুটিকে হত্যা করা হতে পারে।

'বাবুগঞ্জে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে তরুণের আত্মহত্যা'

প্রেমে ব্যর্থ হয়ে এক কিশোর (১৭) আত্মহত্যা করেছে। এক তরুণীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের অবনতি বা মনোমালিন্যের কারণেই ঘরে আড়ার সঙ্গে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে ধারণা করা হয়েছে।

টেলিভিশনের নীতি-নৈতিকতা লঙ্ঘনের চিত্র

টেলিভিশনের বিভিন্ন সংবাদেও আমরা নীতি-নৈতিকতার লঙ্ঘন দেখতে পাই যেমন– বেসরকারি একটি টিভি চ্যানেলে দেখানো হয়েছে কীভাবে ইয়াবা নামক মাদকের ব্যবহার আমাদের দেশের বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং শিশু-কিশোরদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে এবং কেউ কেউ নেশার টাকা জোগাড় করতে গিয়ে এই ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ছে। রিপোর্টে দেখানো এবং বলা হয়েছে ইয়াবার বিভিন্ন নাম, এর মূল্য কত, সেবনের কারণ এবং কীভাবে এটা সেবন করা হয়। এ ছাড়াও রিপোর্টে কেন ইয়াবায় আসক্ত হচ্ছে এটা বর্ণনা করতে গিয়ে কয়েকজন কিশোর/যুবককের ছবি দেখানো হয়েছে এবং নারীরা ও আসক্ত হচ্ছে এটা বর্ণনা করতে গিয়ে নারীদের একটি চিত্র দেখানো হয়েছে, যা দেখে মনে হচ্ছে, ওই কিশোর বা নারীরা এই নেশায় আক্রান্ত। আবার মাদক নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন কয়েকজন কিশোরের ছবি দেখানো এবং সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে কেন চিকিৎসা শেষে আবার তারা এই নেশায় আসক্ত হয়েছে।

> এই প্রতিবেদনগুলো থেকে আপনার কি মনে হচ্ছে যে সাংবাদিকতায় নীতি-নৈতিকতার লঙ্ঘন হয়েছে? যদি হ্যাঁ মনে হয়, তাহলে পাঠক হিসেবে আপনি এবার ভাবুন আপনার চারপাশে নিত্যনৈমিত্তিক যেসব ঘটনা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে তার কতটুকু প্রকাশ করা উচিত বা কীভাবে প্রকাশ করা উচিত।

এ ছাড়াও যেহেতু আমাদের মূল বিষয় শিশুসংক্রান্ত বিষয়ে নীতি-নৈতিকতা মেনে প্রতিবেদন করা, তাই শিশুর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য সংবাদে তাকে উপেক্ষা না করে সংবাদে তার ন্যায্য হিস্যা বা ভাগ নিশ্চিত হলো কি না এবং নীতি-নৈতিকতা মেনে প্রতিবেদন করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে পাঠক হিসেবে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়া এবং বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন, যাতে সর্বত্রই শিশুদের মঙ্গল নিশ্চিত হয়।

আমরা পাঠক হিসেবে সংবাদের এই ভালো-মন্দ দিক বুঝতে পারলেই বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলো প্রতিযোগিতায় গিয়ে প্রতিবেদনের সংখ্যা বৃদ্ধি না করে বরং পাঠকের কথা বিবেচনা করে প্রতিবেদনের মানের দিকে গুরুত্ব দেবে এবং আমরা সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পাব।

যৌক্তিক সংবাদজ্ঞান

শৈশবে যে যেখানে যা বলত সবই খুব সহজে বিশ্বাস করতাম এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই অন্যদের কাছ থেকে যা শুনতাম তার কোনোটাই সুসংবাদ ছিল না। মা-বাবার কথোপকথনে শুনতাম বাজারে জিনিসের দাম খুব বেশি, তাই হয়তো কিছুদিন পরে দেশের মানুষকে না খেয়ে থাকতে হবে– আমি চিন্তায় পড়ে যেতাম যে আমি কীভাবে না খেয়ে থাকব। বড় বোন, ভাইয়ের কাছে শুনতাম টয়লেটে যেতে ইচ্ছা না করলে একটা বিশেষ মন্ত্র পড়লে টয়লেটের বেগ চলে যায়– অনেক অনুনয়-বিনয় করে সে মন্ত্র শিখে তা পড়ে পড়ে টয়লেটে না যাওয়ার চেষ্টা করতাম। নিজের সমবয়সি বন্ধুদের কাছে শুনতাম, রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমালে মানুষ বেশিদিন বাঁচে না– তাই দেরিতে ঘুমানোর চেষ্টা করে প্রত্যেক রাতে মা-র কাছে বকা খেতাম।

প্রতিদিন এরকম নানা কিছু শুনতাম, আর নানা ঝামেলায় পড়তাম। তবে এত কিছুর মাঝে সবচেয়ে ভয়ংকর সংবাদটি শুনেছিলাম আমার মামার কাছে– তিনি একদিন আমাদের সব ভাইবোনকের বললেন যে, সারা পৃথিবীর অবস্থা খুব খারাপ এবং যেকোনো সময় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে যাবে। আমি জানতে চেয়েছিলাম, বিশ্বযুদ্ধ কী? মামা বলেছিলেন বিশ্বযুদ্ধ মানে হলো বিরাট মারামারি, রক্তারক্তি– অনেক মানুষের মৃত্যু।

এ কথা শোনার পর থেকে আমার ভেতরে ভয় ঢুকে গেল, আমার বাবা তো প্রতিদিন অফিসে যায়– সে সময় যদি বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, তাহলে তো তিনি মারা যাবেন। এইটুকু বোঝার পর থেকে, আমার বাবা যত দিন অফিসে যেতেন আমি হাউমাউ করে কাঁদতাম। এই কান্না বহুদিন চলেছিল এবং আজ পর্যন্ত আমার বাবা জানেন না, আমি সেই সময় কেন কাঁদতাম।

এখন সামান্য জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার পর বুঝতে পারি যে, যেকোনো কিছু বা যেকোনো সংবাদ শোনার পর তা অন্ধভাবে বিশ্বাস করার কারণেই আমার ওই দুর্গতি হয়েছিল।

তার পরও নিজেকে এখনো সান্তনা দিই এই বলে যে বড়রাও তো এখনো এভাবেই অনেক কিছু বিশ্বাস করছে। শত শত বছর ধরেই একদল অতি চালাক মানুষ বিভিন্ন প্রপাগান্ডার বা প্রচারমাধ্যমে অন্যদের ভুল তথ্য দিচ্ছে– আর খোলস বদলানো মিথ্যাগুলো সবাই বিশ্বাস করে যাচ্ছে। এই বিশ্বাসের একটি কারণ হতে পারে যে সাধারণ মানুষেরা সাধারণত কোনো সংবাদের সত্য-অসত্যতা নিয়ে প্রশ্ন করে না, জানতে চায় না কোনো সংবাদের তথ্যগুলোর ভিত্তি কী এবং একই সঙ্গে তাকে ক্রস-চেক করার বা যাচাই করার প্রয়োজনও বোধ করে না।

এই পরিস্থিতি মোটামুটি সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্যই প্রযোজ্য– অনেক সময় অনেক উচ্চশিক্ষিত মানুষকেও সরলভাবে সবকিছুই বিশ্বাস করে ফেলতে দেখা যায়। কিন্তু এই পরিস্থিতি একটি উন্নয়নকামী সমাজের জন্য দীর্ঘমেয়াদি সুফল বয়ে আনতে পারে না– যেমনটা ইরাক যুদ্ধ পাশ্চাত্যের দেশগুলোর জন্য হয়েছে এবং যার সরল স্বীকারোক্তি আমরা ২০১৫ সালে ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের কাছ থেকে পেয়েছি, যখন তিনি বলেছেন তাঁর সময়ে ইরাক-সংশ্লিষ্ট তথ্য পুরোপুরি সঠিক ছিল না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সে সময় ইরাক যুদ্ধের বিরোধিতা করে কিংবা বলা যেতে পারে গণমাধ্যমে প্রচারিত সংবাদের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন করে অনেক মুক্তমনা যুক্তিবাদী মানুষ পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রগুলোর বিরাগভাজন হয়েছেন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এই মুক্তমনা যুক্তিবাদী মানুষগুলো কারা– শুধুই কি উচ্চশিক্ষিত জনেরা, নাকি সমাজের ওপরতলার মানুষেরা। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি বলে বয়স, শিক্ষা, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে ওই মুক্তমনা যুক্তিবাদী মানুষ যে-কেউই হতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার ভেতরে সেই যুক্তি, মেধা, এবং পরিশীলিত ও পরিমিত শৈল্পিক উপস্থাপনার ক্ষমতা আছে। এ ক্ষেত্রে আমার মনে হয় বিতার্কিকরা সবচেয়ে ভালো অবস্থানে আছেন– যৌক্তিকভাবে যেকোনো সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করার জন্য, এ ছাড়াও এদের মধ্যে মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ দুটো দেখার প্রবণতা রয়েছে।

আর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিতার্কিকরা বহুদিন ধরেই (নব্বইয়ের দশক থেকে) বস্তুনিষ্ঠ ও বাস্তব যুক্তির সার্থক ব্যবহার করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তরুণ প্রজন্মের কাছে খুব সহজ করে তুলে ধরতে পেরেছেন। শতাব্দীর পুরোনো 'দিব্যজ্ঞান বা ধর্মতত্ত্ব'-র শৈল্পিক উপস্থাপনা বর্তমানে এ দেশে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে।

অন্যদিকে, ২০১১-র আদমশুমারি ও গৃহগণনার তথ্য অনুসারে আরেকটি মজার বিষয় নীতিনির্ধারকদের সামনে চলে এসেছে– তা হচ্ছে, বর্তমানে এ দেশে কিশোর-কিশোরী এবং তরুণ-তরুণী জনগোষ্ঠী, কমবয়সি বা বৃদ্ধদের তুলনায় বেশি শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে– যা কিনা আজ থেকে দশ বছর আগেও অন্য রকম ছিল।

তাই এ কথা খুব সহজেই বলা যায় যে, বর্তমানের এই সংখ্যাগত দিক দিয়ে শক্তিশালী তরুণ জনগোষ্ঠীকে যদি মেধা ও যৌক্তিক দিক দিয়েও শক্তিশালী করে তোলা যায়, যারা যেকোনো তথ্য বা সংবাদ তার নৈতিকতা এবং বস্তুনিষ্ঠতার মাপকাঠিতে বিচার করতে পারবেন, তাহলে আমাদের এই দেশ বাস্তবিক অর্থেই সকল দেশের সেরা হতে পারবে।

এ এম শাকিল ফয়জুল্লাহ্
কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট, ইউনিসেফ বাংলাদেশ

শিশু অধিকার সনদ ও প্রাসঙ্গিক জাতীয় আইন

শিশু অধিকার সনদ

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ– ইউএনসিআরসি ২০ নভেম্বর, ১৯৮৯ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। গুরুত্বপূর্ণ এই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন, তথা চুক্তিটি ২ সেপ্টেম্বর ১৯৯০ তারিখ থেকে কার্যকর হয়। এর পরে ২৫ মে ২০০০ তারিখে এ সনদে দুটি ঐচ্ছিক বিধি বা অপশনাল প্রোটোকল যুক্ত হয়েছে।

যে ২২টি দেশ প্রথম এ সনদ অনুমোদন (র‍্যাটিফাই) করেছিল তাদের একটি বাংলাদেশ। বাংলাদেশ এটা অনুমোদন করে ৩ আগস্ট ১৯৯০ তারিখে। বাংলাদেশ ২০০০ সালে ঐচ্ছিক বিধি দুটিও অনুমোদন করেছে। এ বই লেখা পর্যন্ত জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে কেবল সোমালিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের এ সনদ অনুমোদন করা বাকি রয়েছে। তবে সে দেশ দুটিও সনদে সই করেছে।

এ সনদ বলছে, প্রতিটি শিশু একেকজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি– নিজের দাবিতে মাথা তুলে চলার মতো পুরো মানুষ। তার ভালোভাবে বেঁচে থেকে, নিজের সবটুকু সম্ভাবনার পুরো বিকাশ করে, প্রয়োজনীয় সুরক্ষা পেয়ে, পরিবারে-সমাজে-জীবনে সক্রিয় অংশ নিয়ে নিরন্তর গড়ে ওঠার অধিকার রয়েছে। অধিকারগুলো ভোগ করে বেড়ে ওঠার প্রতিটি ধাপে সে তার বয়সোচিত দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করবে।

এ সনদের ৫৪টি অনুচ্ছেদে শিশুর মানবাধিকারের ব্যাপক বৃত্ত প্রতিফলিত হয়েছে এবং সেগুলো সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ও সরকারের দায়িত্ব চিহ্নিত হয়েছে। এ ছাড়া, শিশুর জীবনে পরিবারের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাবা-মাসহ পরিবার ও সমাজ এবং বেসরকারি সংস্থার দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে; সামাজিক সুরক্ষার কথা এসেছে; গণমাধ্যমের ভূমিকার উল্লেখ আছে। অন্যদিকে, অন্যের অধিকার, বিশেষত বাবা-মার অধিকারকে শ্রদ্ধা করার ব্যাপারে শিশুর দায়িত্বের কথাও বলা হয়েছে।

মোট ৫৪ অনুচ্ছেদের ৪১টিতে একেকটি করে অধিকারের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। সনদ গুরুত্ব দিচ্ছে যে, সব শিশুর একই অধিকার আছে; অধিকারগুলো পরস্পর-সম্পর্কিত এবং প্রতিটি অধিকারই সমান জরুরি। কঠিন পরিস্থিতিতে থাকা বা সুযোগবঞ্চিত শিশুদের জন্য বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলা হয়েছে।

সনদে বলা শিশুর অধিকারগুলোকে চারটি বড় ক্ষেত্রে ভাগ করা যায় :

- **বেঁচে থাকার অধিকার–** প্রতিটি শিশুর অধিকার আছে ভালোভাবে বেঁচে থাকার এবং সেজন্য যা-কিছু প্রয়োজন তা পাওয়ার। এ অধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে পুষ্টি, আশ্রয়, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ও পর্যাপ্ত মানসম্মত জীবনযাত্রার অধিকার।

- **বিকাশের অধিকার–** প্রতিটি শিশুর অধিকার আছে নিজের সবটুকু সম্ভাবনা বিকশিত করার। শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, মানসিক, নৈতিক, আত্মিক ও সামাজিক সবরকম বিকাশই শিশুর জন্য জরুরি। এ অধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, খেলাধুলা ও অবকাশ উপভোগ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, তথ্য পাওয়া এবং চিন্তা, বিবেক ও বিশ্বাস বা ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার।
- **সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার–** এ অধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে সব ধরনের নির্যাতন, আঘাত-অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা, দুর্ব্যবহার, শোষণ ও অবহেলা থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার। শরণার্থী শিশুর বিশেষ সুরক্ষা; শ্রমজীবী শিশুর জন্য সুরক্ষা-বন্দোবস্ত; মাদকাসক্তি ও মাদক ব্যবসায় ব্যবহৃত হওয়া থেকে সুরক্ষা; যৌন নিপীড়ন ও শোষণ থেকে সুরক্ষা; নির্যাতন/শোষণের শিকার শিশুদের দেখভাল ও পুনর্বাসন; ফৌজদারি আইন ও বিচার প্রক্রিয়ায় এর সংস্পর্শে আসা শিশুদের সুরক্ষা; এবং পরিবার-বিচ্ছিন্নতাসহ নাজুক পরিস্থিতিগুলোর কথা এসেছে।
- **অংশগ্রহণের অধিকার–** এ অধিকার বলছে প্রতিটি শিশুকে তার পরিবারে, এলাকার সমাজে ও জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে দিতে হবে। এ অধিকারগুলোর মধ্যে পড়ছে শিশুর জীবনকে প্রভাবিত করার মতো বিষয়ে তার মতামত দেয়া ও সেটার গুরুত্ব পাওয়ার অধিকার। তার সক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সে আরো বেশি করে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে। এটা তার পূর্ণবয়স্ক দায়িত্বশীল মানুষ হওয়ার প্রস্তুতিরই অংশ। তার সংগঠন ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করার অধিকারের কথাও বলা হয়েছে।

আলাদা আলাদা অনুচ্ছেদে শরণার্থী শিশু (অনুচ্ছেদ ২২), প্রতিবন্ধী শিশু (অনুচ্ছেদ ২৩), জাতিগত/গোষ্ঠীগত/ধর্মীয়/ভাষাগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর শিশু ও আদিবাসী শিশু (অনুচ্ছেদ ৩০) এবং তাদের অধিকারকে সুনির্দিষ্টভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সিআরসির অপশনাল প্রোটোকল দুটি খুবই নাজুক ও ঝুঁকিপূর্ণ কিছু পরিস্থিতি থেকে শিশুর সুরক্ষার অধিকারের কথা বলছে :

- শিশু বিক্রি, শিশুকে যৌনবৃত্তি ও পর্নোগ্রাফিতে ব্যবহার করা।
- সশস্ত্র সংগ্রামে/যুদ্ধে শিশুকে জড়িত করা।

এদিকে, চারটি অনুচ্ছেদকে সনদে বর্ণিত সবগুলো অধিকার বাস্তবায়নের ভিত্তি-বিবেচনা হিসেবে গণ্য করা হয়। 'সাধারণ মূলনীতি' বলে পরিচিত এ অনুচ্ছেদগুলো হচ্ছে :

- ✓ **অনুচ্ছেদ ২–বৈষম্যহীনতা :** সনদে বর্ণিত সবগুলো অধিকার সকল শিশুকেই দিতে হবে। গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক ভিন্নমত, জাতীয়তা অথবা সামাজিক পরিচয়, অর্থনৈতিক অবস্থা, সামর্থ্য, জন্মসূত্রে, কিংবা বংশগত অবস্থান– কোনো কারণেই কোনো বৈষম্য করা যাবে না।

- ✓ **অনুচ্ছেদ ৩– সর্বোত্তম স্বার্থ :** শিশুসংক্রান্ত যে-কারো যেকোনো কাজে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই প্রথম বিবেচনা পাবে। সরকারি, বেসরকারি সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান, আদালত, প্রশাসন– সবার কর্মকাণ্ডকেই এটা মেনে চলতে হবে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব থাকবে, বাবা-মা বা আইনসংগত অভিভাবক শিশুর কল্যাণের দায়িত্ব পালন করছেন কি না, তা নিশ্চিত করা।
- ✓ **অনুচ্ছেদ ৬– জীবন ও উন্নয়ন :** জীবন প্রতিটি শিশুর জন্মগত অধিকার। প্রতিটি শিশুর বেঁচে থাকা ও উন্নয়ন/বিকাশের নিশ্চয়তা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।
- ✓ **অনুচ্ছেদ ১২–মতপ্রকাশ ও সেটার গুরুত্ব :** শিশুকে প্রভাবিত করে এমন যেকোনো বিষয়ে তার মতামত বিবেচনায় নিতে হবে। মতামত জানানোর ক্ষমতা যার হয়েছে সে-ই মত ও ধারণা প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারী। শিশুর বয়স ও নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা অনুযায়ী এসব মতামতের যথাযথ গুরুত্ব পাওয়া নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে শিশুকে পরিস্থিতি অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট সুযোগ দিতে হবে।

অনুমোদন ও বাস্তবায়ন– বাংলাদেশ পরিস্থিতি

এ সনদ অনুমোদন করা মানে এর বিধানগুলো বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক আইনগতভাবে বাধ্য থাকা। সনদে বলা আছে, অনুমোদনকারী রাষ্ট্র শিশুর এসব অধিকার বাস্তবায়নের জন্য সব ধরনের আইনগত, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। এজন্য প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক সহায়তার কথা বলা আছে। অধিকারগুলো সম্পর্কে শিশুসহ সবাইকে জানানোর কার্যকর উদ্যোগ নেয়াও রাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যে পড়বে।

সনদ বাস্তবায়ন পরিস্থিতির নজরদারি করার জন্য আছে আন্তর্জাতিকভাবে নির্বাচিত স্বাধীন/স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞদের নিয়ে করা শিশু অধিকার কমিটি। সনদ অনুমোদনকারী দেশগুলোর এ কমিটির কাছে নিজ নিজ দেশে শিশুর পরিস্থিতি সম্পর্কে নিয়মিত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা। সে প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে কমিটি পরামর্শ দিয়ে থাকে। কমিটি রাষ্ট্রগুলোকে শিশুর জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত করে।

বাংলাদেশ সনদটি অনুমোদন করার সময় দুটি অনুচ্ছেদ সম্পর্কে অপারগতা (রিজার্ভেশন) প্রকাশ করেছিল :

- ✓ অনুচ্ছেদ ১৪-এর প্রথম স্তবক– শিশুর চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে সম্মান জানানোর প্রশ্নে।
- ✓ অনুচ্ছেদ ২১– শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনা করে শিশুকে দত্তক দেওয়ার ব্যবস্থা করার প্রশ্নে। বাংলাদেশ বলেছে, বিদ্যমান আইন ও প্রথার সঙ্গে সংগতি রেখে এ প্রশ্নে কাজ করা হবে। ইসলামের ধর্মীয় বিধিনিষেধের কারণে বাংলাদেশে দত্তক আইনসিদ্ধ নয়; কেবল অভিভাবকত্ব নেওয়া চলে।

ওপরে বর্ণিত আপত্তি দুটি এখনো তুলে নেওয়া হয়নি। সিআরসির সঙ্গে সামঞ্জস্য করে আইনগত সংস্কার বা প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়নে ঘাটতি আছে; এ প্রসঙ্গে কিছু বিতর্কও আছে। এ ছাড়া, কমিটির কাছে পাঁচ বছরওয়ারি প্রতিবেদন পেশ করার কাজে ঢিলেমি হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক জাতীয় আইন

অনেকগুলো কারণেই শিশুসংক্রান্ত জাতীয় আইনগুলো ভালোভাবে জানার গুরুত্ব আছে। শিশুসংক্রান্ত যেসব বিষয়ে রিপোর্ট করতে গেলে আইনের ধারণা প্রয়োজন হবে সে পরিস্থিতিগুলোর মধ্যে রয়েছে :

- ✓ শিশু যখন কোনো অপরাধ, সহিংসতা, নির্যাতন, শোষণের শিকার হচ্ছে, অর্থাৎ– সে যখন ভিকটিম।
- ✓ বিশেষভাবে জরুরি হবে যৌন নির্যাতন ও হয়রানি, অ্যাসিড-সন্ত্রাস, হয়রানি-শোষণ-নির্যাতনের কারণে হত্যা বা আত্মহত্যার মতো ক্ষেত্রগুলো।
- ✓ শিশুকে যৌনবৃত্তিতে ব্যবহার করা।
- ✓ শিশু পাচার।
- ✓ শিশু যখন ফৌজদারি আইনপরিপন্থি অথবা গুরুতর সমাজবিরোধী কোনো কাজে জড়িয়ে পড়ে, অর্থাৎ– সে যখন অভিযুক্ত বা অপরাধমূলক কাজ করেছে বলে প্রমাণিত হয়। বিশেষভাবে জরুরি হবে তার সম্পর্কে আইনি প্রক্রিয়া, তার প্রতি আইনি প্রক্রিয়ায় জড়িতদের আচরণ, তার হেফাজত, সুরক্ষা, তার প্রতি কোনো অপরাধের দায়িত্ব আরোপ, বিচারপ্রক্রিয়া ও তার প্রতি আইনি ব্যবস্থা বা বিধানের ক্ষেত্রগুলো।
- ✓ সাংবাদিকতা ও সংবাদমাধ্যমের আচরণ/করণীয় সম্পর্কে আইনি বাধ্যবাধকতা; বিশেষ করে ওপরের দুই ক্ষেত্রে, সাধারণভাবে ব্যক্তির মানসম্মান ও অশ্লীলতার প্রসঙ্গে, এবং যেকোনো মামলা চলাকালে আদালতের বিধিনিষেধ-সংক্রান্ত।
- ✓ শিশুশ্রম, বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম।
- ✓ বাল্যবিবাহ।
- ✓ শিশুর প্রতিপালন, অভিভাবকত্ব, উত্তরাধিকার, সম্পত্তির অধিকারসহ বিভিন্ন পারিবারিক বিষয়ে।
- ✓ যেকোনো চুক্তিতে যখন কোনো শিশুর জড়িত থাকার প্রশ্ন উঠবে তখন।
- ✓ শিশুর নাগরিকত্ব এবং জন্মের স্বীকৃতি ও অধিকারের প্রশ্নে।

মনে রাখা প্রয়োজন, এ ক্ষেত্রগুলো কিন্তু শিশু অধিকার সনদেরও বিবেচ্য বিষয়। বাংলাদেশে এসব ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বেশ কিছু আইন আছে। এর মধ্যে উল্লেখ্য :

- ✓ শিশু আইন, ২০১৩
- ✓ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩)
- ✓ দণ্ডবিধি, ১৮৬০– ৮২ নম্বর ধারা; অপরাধের দায়িত্ব আরোপসংক্রান্ত
- ✓ সাবালকত্ব আইন, ১৮৭৫
- ✓ সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২
- ✓ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬
- ✓ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯
- ✓ অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০
- ✓ বিভিন্ন ধর্মানুসারী পারিবারিক আইন
- ✓ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪
- ✓ নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০৯
- ✓ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৭ (১), ১৮, ও ২৮ নম্বর অনুচ্ছেদ; দেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানের এ অনুচ্ছেদগুলো শিশুর কল্যাণ ও অধিকারের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

এ ছাড়া নীতি-নৈতিকতার সুবাদে সাধারণভাবে কিছু আইন মনে রাখা দরকার :

- ✓ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ৩১ ও ৩৯ নম্বর অনুচ্ছেদ; সংবিধানের এ অনুচ্ছেদগুলোয় নাগরিকদের প্রাসঙ্গিক কিছু অধিকার ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার নিশ্চয়তার কথা আছে।
- ✓ প্রেস কাউন্সিল আইন, ১৯৭৪
- ✓ দণ্ডবিধি, ১৮৬০– ৪৯৯ ও ৫০০ নম্বর ধারা; ২৯২, ২৯৩ ও ২৯৪ নম্বর ধারা; ২৯৫ (ক) ধারা; এবং আদালত-অবমাননার ঝুঁকি।

শিশু এবং সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতার জন্য এসব আইনের প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক দেখা যাক।

শিশু আইন, ২০১৩ : শিশুবিষয়ে এটি দেশের প্রধান আইন। এই আইনে শিশুর সুরক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। এ আইনটিকে অনেক সময় শিশুর জন্য সামাজিক কল্যাণমূলক আইন হিসেবেও ব্যাখ্যা করা হয়। এ আইনে শিশুর প্রাতিষ্ঠানিক হেফাজত, যত্ন, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানের বিষয়গুলো এসেছে। তাই 'আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু' এবং 'আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু'দের

সর্বোত্তম স্বার্থ সুরক্ষার জন্য প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ, প্রত্যেক থানায় শিশুবিষয়ক ডেস্ক এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা নিয়োগ; জাতীয় পর্যায়ে এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিশু কল্যাণ বোর্ড গঠনের কথা বলা হয়েছে। যার মাধ্যমে শিশুদের সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

- এই আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ৯ (নয়) বৎসরের নিম্নের কোন শিশুকে কোন অবস্থাতেই গ্রেফতার করা বা, ক্ষেত্রমত, আটক রাখা যাইবে না; অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন শিশুকে নিবর্তনমূলক আটকাদেশ সংক্রান্ত কোন আইনের অধীন গ্রেফতার বা আটক করা যাইবে না।

- কোন শিশুকে গ্রেফতারের পর গ্রেফতারকারী কর্মকর্তা কর্তৃক থানায় আনয়ন করিলে শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা শিশুর মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্যকে, প্রবেশন কর্মকর্তাকে এবং প্রয়োজনে নিকটস্থ বোর্ডকে উক্ত গ্রেফতার সম্পর্কে অবহিত করিবেন।

- ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ২৩৯ অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশুকে কোন প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীর সহিত একসঙ্গে কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত করিয়া একত্রে চার্জশীট প্রদান করা যাইবে না।

- ফৌজদারি অপরাধমূলক কাজে অভিযুক্ত শিশুর বিচার কখনোই প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে একত্রে হবে না; আলাদা শিশু আদালতে হতে হবে; তার স্বার্থ দেখভালের জন্য, তাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রবেশন কর্মকর্তা নিযুক্ত থাকবেন। সে কাজ যা-ই হোক না কেন, শিশুকে 'অপরাধী' বলা যাবে না।

- অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন শিশুকে মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা কারাদণ্ড প্রদান করা যাইবে না;

  তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিশুকে যখন এইরূপ কোন মারাত্মক ধরনের অপরাধ সংঘটন করিতে দেখা যায় যে, তজ্জন্য এই আইনের অধীন প্রদানযোগ্য কোন আটকাদেশ আদালতের মতে পর্যাপ্ত নহে, অথবা আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে শিশুটি এত বেশি অবাধ্য অথবা ভ্রষ্ট চরিত্র যে তাহাকে কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা চলে না এবং অন্যান্য যে সকল আইনানুগ পন্থায় মামলাটির সুরাহা হইতে পারে উহাদের কোন একটিও তাহার জন্য উপযুক্ত নহে, তাহা হইলে শিশু-আদালত শিশুকে কারাদণ্ড প্রদান করিয়া কারাগারে প্রেরণের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

- কোন শিশু মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধে দোষী প্রমাণিত হইলে শিশু-আদালত তাহাকে অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) বৎসর এবং অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে আটকাদেশ প্রদান করিয়া শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে আটক রাখিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিশু মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় নয় এমন কোন অপরাধে দোষী প্রমাণিত হইলে শিশু-আদালত তাহাকে অনধিক ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে আটকাদেশ প্রদান করিয়া শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে আটক রাখিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ : এ আইনটি নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সংঘটিত অনেকগুলো অপরাধের বিচারের জন্য প্রণীত হয়েছে।

- এর মধ্যে রয়েছে দহনকারী-ক্ষয়কারী বা বিষাক্ত পদার্থ দিয়ে মৃত্যু ঘটানো বা সে চেষ্টা, তা থেকে অঙ্গহানি বা বিকৃতি; ধর্ষণ ও সে কারণে মৃত্যু; যৌতুকের জন্য নারীর মৃত্যু ঘটানো; যৌন পীড়ন; পাচার; অপহরণ; আত্মহত্যায় প্ররোচনা; ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগের উদ্দেশ্যে শিশুর অঙ্গহানি এবং ধর্ষণের ফলে জন্মানো শিশুসংক্রান্ত বিধান।

- বিদ্যমান অন্য কোনো আইনে যা-কিছুই থাকুক না কেন, এসব বিষয়ে এ আইনটিই প্রাধান্য পাবে। এর আওতায় পড়া অপরাধের বিচার কেবল এর জন্য গঠিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে করা যাবে। ক্যামেরা ট্রায়াল অর্থাৎ রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিচারের সুযোগ রাখা হয়েছে। আসামি পলাতক থাকলেও তার অনুপস্থিতিতে বিচার করা চলবে। এ আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং সেই সঙ্গে অনূর্ধ্ব এক লাখ টাকা জরিমানা।

- আইনটির ধারা ৩১-এ বলা হয়েছে যে, বিচার চলাকালে ট্রাইব্যুনাল ওই নারী বা শিশুকে নিরাপত্তামূলক হেফাজতে রাখা দরকার মনে করলে তাকে রাখতে হবে কারাগারের বাইরে। সেটা সরকারি কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা হেফাজতের স্থান হতে পারে। আবার, ট্রাইব্যুনালের বিবেচনায় যথাযথ বলে গণ্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার কাছেও তাকে রাখা যেতে পারে।

- লক্ষণীয় যে, সংশোধিত এ আইনে শিশু/কিশোরীর যৌন হয়রানি সম্পর্কে সরাসরি কোনো কথা রাখা হয়নি; যদিও এর ১০ নম্বর ধারায় নারী ও শিশুর যৌন পীড়নের প্রসঙ্গ আছে। এ ছাড়া, নারী পাচার প্রসঙ্গে যৌনবৃত্তিতে নিয়োগের কথা এলেও শিশু পাচারের ক্ষেত্রে সরাসরি সে কথা খুলে বলা হয়নি। যৌনবৃত্তিতে অপ্রাপ্তবয়স্ক কাউকে নিয়োগের নিষেধাজ্ঞা ও সাজা অবশ্য পুলিশ অধ্যাদেশেসহ আরো দু-একটি আইনে আছে।

- এদিকে এ আইনে শিশুর বয়সসীমা অনূর্ধ্ব-১৬, অর্থাৎ শিশু অধিকার সনদ ও শিশু আইনে উল্লেখিত বয়সের চেয়ে কম।

আইনে সাংবাদিকের জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশ : ওপরে বর্ণিত দুটি আইনেই এগুলোর সংস্পর্শে আসা শিশুর নাম-পরিচয়ের সুরক্ষা, অর্থাৎ– শিশুকে শনাক্ত না করানোর বিধান রয়েছে।

- শিশু আইন, ২০১৩-এর ধারা ২৮(১)-এ বলা হয়েছে যে, 'শিশু-আদালতে বিচারাধীন কোন মামলায় জড়িত বা সাক্ষ্য প্রদানকারী কোন শিশুর ছবি বা এমন কোন বর্ণনা, সংবাদ বা রিপোর্ট প্রিন্ট বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম অথবা ইন্টারনেটে প্রকাশ বা প্রচার করা যাইবে না যাহা সংশ্লিষ্ট শিশুকে শনাক্তকরণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে।'

  তবে এ ধারাটিতে আরো বলা আছে, 'এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশুর ছবি, বর্ণনা, সংবাদ বা রিপোর্ট প্রকাশ করা শিশুর স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর হইবে না মর্মে শিশু-আদালতের নিকট প্রতীয়মান হইলে উক্ত আদালত সংশ্লিষ্ট শিশুর ছবি, বর্ণনা, সংবাদ বা রিপোর্ট প্রকাশের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।'

আবার শিশু আইন, ২০১৩-এর

- ধারা ৮১(১)-এ বলা হয়েছে এই আইনের অধীন বিচারাধীন কোন মামলা বা বিচার কার্যক্রম সম্পর্কে প্রিন্ট বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোন শিশুর স্বার্থের পরিপন্থী এমন কোন প্রতিবেদন, ছবি বা তথ্য প্রকাশ করা যাইবে না, যাহার দ্বারা শিশুটিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শনাক্ত করা যায়।

  (২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

  (৩) কোন কোম্পানী, সমিতি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী, সমিতি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন অনধিক ২ (দুই) মাসের জন্য স্থগিত রাখাসহ উহাকে অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

এ ধারাগুলো তলিয়ে ভাবলে আরো বোঝা যায় যে, আইনটির একটি মূল লক্ষ্য হচ্ছে আইনপরিপন্থি কাজে জড়িত শিশুকে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। সাজা দিয়ে তাকে বিষিয়ে দিলে, নিজেকে পাল্টানোর সুযোগ না দিলে অথবা আপনি পরিচয় প্রকাশ করে তাকে ধিক্কার-বিড়ম্বনার মধ্যে ঠেলে দিলে শিশুটি অপরাধের জগতেই রয়ে যেতে পারে। সেটা ওই শিশুটির প্রতি যেমন অন্যায্য হবে, তেমনি সমাজের জন্যও হানিকর হবে।

- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ধারা ১৪ সংবাদমাধ্যমে অপরাধের শিকার নারী বা শিশুকে শনাক্ত না করতে বলছে। এর নিষেধাজ্ঞাটি আরো স্পষ্ট : 'এই আইনে বর্ণিত অপরাধের শিকার হয়েছেন এরূপ নারী ও শিশুর ব্যাপারে সংঘটিত অপরাধ বা তৎসম্পর্কিত আইনগত কার্যধারার সংবাদ বা তথ্য বা নাম-ঠিকানা বা অন্যবিধ তথ্য কোনো সংবাদপত্র বা অন্য কোনো সংবাদমাধ্যমে এমনভাবে প্রকাশ বা পরিবেশন করা যাবে, যাতে উক্ত নারী বা শিশুর পরিচয় প্রকাশ না যায়।'

- এ নির্দেশ লঙ্ঘন করলে দায়ী সাংবাদিক/সাংবাদিকদের প্রত্যেককে অনধিক দুই বছর জেল খাটতে হবে বা অনূর্ধ্ব এক লাখ টাকা জরিমানা গুনতে হবে অথবা দুটি দণ্ডই ভুগতে হবে।

— **দুটি আইনের পরিচয়-গোপন সংক্রান্ত নির্দেশ** মিলিয়ে পড়লে বলা যায়, নির্দিষ্ট কিছু অপরাধের শিকার শিশুর নাম-পরিচয়-ছবি-শনাক্তকরণযোগ্য তথ্য, বিশেষত সে যৌন নিপীড়নের শিকার হলে, কখনো প্রকাশ করা যাবে না। নারী ও শিশুরা আইন বর্ণিত যেকোনো অপরাধের শিকার হলে, যেমন– পাচার বা অপহরণের ক্ষেত্রেও, সংবাদে তাদের পরিচিতি প্রকাশ কিন্তু আইনত দণ্ডণীয় হচ্ছে। এ ছাড়া, ফৌজদারি আইনপরিপন্থি কাজে জড়িত শিশু সম্পর্কে যেকোনো প্রতিবেদনেই তার পরিচয়ের গোপনীয়তা মানা দরকার। তার সম্পর্কে 'অপরাধী' বা 'সাজা'-জাতীয় কোনো শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। সংবাদে পরিচয় গোপন রাখার আইনগত বিধান কিন্তু মৃত্যুর পরও প্রযোজ্য বলে বিবেচনার সুযোগ আছে।

মনে রাখা ভালো, পরিচয় গোপনের এই বিধান করা হয়েছে শিশুর সর্বোত্তম কল্যাণের লক্ষ্যে। অর্থাৎ– এটা বলছে, সংবাদযোগ্য ঘটনায় জড়িত কোনো শিশুর কোনো ক্ষতি বা বিপত্তি না ঘটানোর দিকে কড়া নজর রেখে রিপোর্ট করা প্রয়োজন।

আইনপরিপন্থি কাজে জড়িয়ে পড়া শিশুর ক্ষেত্রে বিচারপ্রক্রিয়ায় শিশু আইন মানা না হলে সেটা রিপোর্ট করা খুব জরুরি। শিশুর বয়স প্রমাণ, আলাদা আদালত গঠন, প্রবেশন অফিসার নিয়োগ, তার সম্পর্কে কী ব্যবস্থা হচ্ছে, কোথায় তাকে রাখা হচ্ছে– এ সবই রিপোর্ট করার বিষয়।

শ্রম আইন, ২০০৬ (ধারা ৩৪ থেকে ৪৪) : বাংলাদেশে শিশুশ্রম যেমন বড় একটি সমস্যা, তেমনি দারিদ্র্যের প্রেক্ষাপটে এটা অনভিপ্রেত একটি বাস্তবতা। আইনটি এ বাস্তবতাকে আমলে নিয়ে শিশুর ঝুঁকি কিছুটা কমানোর কথা বলছে। তবে ফাঁকফোকর ও প্রশ্ন করার যথেষ্ট জায়গা আছে।

— এ আইনে ১৪ বছরের কমবয়সিরা শিশু এবং তাদের কোনো শ্রমে নিয়োগ করা যাবে না। তবে ১২ থেকে ১৪ বছর বয়স অব্দি শিশুকে এমন কোনো হালকা কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে, যা তার স্বাস্থ্য বা উন্নতির জন্য বিপজ্জনক হবে না এবং তার লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটাবে না। শিশুটি স্কুলে গেলে তাকে কাজ করাতে হবে সে সময়ের বাইরে।

— বয়স ১৪ পূর্ণ হলে সে ১৮ বছরের হওয়ার আগ পর্যন্ত কিশোর হিসেবে বিবেচিত হবে। একজন নিবন্ধিত চিকিৎসকের কাছ থেকে সক্ষমতার প্রত্যয়নপত্র নিয়ে কিশোরকে কাজে নিয়োগ দেওয়া যাবে। এ প্রত্যয়নপত্রের খরচ/ফি নিয়োগকর্তা দেবেন। কোনো পেশা বা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশি অথবা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে নিয়োগের জন্য এ প্রত্যয়নপত্র লাগবে না। এ ছাড়া, জরুরি অবস্থা বিরাজমান থাকলে এবং জনস্বার্থে প্রয়োজন মনে করলে সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দিয়ে

নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সক্ষমতা-প্রত্যয়পত্রের আবশ্যকতার বিধান স্থগিত করতে পারবে।

- তবে কিশোরকে কোনো ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিযুক্ত করা যাবে না। আইনে এমন কিছু কাজ ও শর্ত সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে :
    - ✓ যন্ত্রপাতি চালু অবস্থায় সেটা পরিষ্কার করা, তাতে তেল দেওয়া বা অন্য কোনো কাজের জন্য যন্ত্রের ঘূর্ণায়মান অংশের মাঝখানে বা কাছাকাছি কোনো কিশোরকে প্রবেশ করানো যাবে না।
    - ✓ সরকারঘোষিত বিপজ্জনক যন্ত্রপাতির কাজে কিশোরকে নিয়োগ করতে হলে কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে–
        - তাকে ঝুঁকিগুলো এবং প্রয়োজনীয় সাবধানতার ব্যবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কার জানাতে হবে;
        - ওই কাজে তার পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ থাকতে হবে অথবা তাকে কোনো পুরোপুরি অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে কাজ করতে হবে।
    - ✓ সরকারকে সময় সময় গেজেট বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা প্রকাশ করতে হবে এবং সেসব কাজে কিশোর বয়স্কদের নিয়োগ করা যাবে না।
    - ✓ কিশোরকে দিয়ে ভূগর্ভে বা পানির নিচে কোনো কাজ করানো যাবে না।
- এ ছাড়া, কিশোরকে দিয়ে দিনে এবং সপ্তাহে নির্দিষ্ট সময়ের বেশি কাজ করানো যাবে না :
    - ✓ কারখানা বা খনিতে দিনে পাঁচ ঘণ্টা এবং সপ্তাহে ৩০ ঘণ্টার বেশি নয়। লক্ষ করুন, ভূগর্ভে কাজ নিষিদ্ধ হলেও 'খনি'তে কাজের কথা বলা হয়েছে।
    - ✓ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে দিনে সাত ঘণ্টা এবং সপ্তাহে ৪২ ঘণ্টার বেশি নয়।

      সন্ধ্যা সাতটা থেকে সকাল সাতটার মধ্যে কিশোরকে দিয়ে কাজ করানো যাবে না।
- কিশোরকে দিয়ে বাড়তি সময় বা ওভারটাইম কাজ করাতে হলে কারখানা বা খনিতে তার মোট কাজের সময় সপ্তাহে ৩৬ ঘণ্টা ছাড়াতে পারবে না। অন্য প্রতিষ্ঠানে এ সীমা সপ্তাহে মোট ৪৮ ঘণ্টা।

সাবালকত্ব আইন, ১৮৭৫ : এ আইন বলছে, ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে কোনো ব্যক্তি কোনো চুক্তির পক্ষ হতে পারবে না বা তার সঙ্গে কোনো রকম চুক্তি করা যাবে না। কিন্তু মনে রাখুন– এ আইনটির বয়সের সীমাসংক্রান্ত বিধান বিয়ে, তালাক ইত্যাদি পারিবারিক বিষয়ে এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না।

বিভিন্ন পারিবারিক আইন : বিয়ে, বিবাহবিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্ব, সম্পত্তির উত্তরাধিকার– ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন ধর্মানুসারী পারিবারিক আইন কার্যকর হয়। এ আইনগুলোর পরস্পরের মধ্যে সমতা নেই। ফলে একেক ধর্মের শিশুদের এসব অনেক অধিকার একেক রকম হয়ে যায়।

- ✓ মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১-তে অনেকখানি যুগোপযোগী সংস্কার হয়েছে। কিন্তু তার পরও সাধারণ আইনের সঙ্গে পার্থক্য রয়ে গেছে।
- ✓ হিন্দু ও খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের জন্য পৃথক পৃথক পারিবারিক আইন আছে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে হিন্দু পারিবারিক আইন অনুসৃত হয়।

বাল্য-বিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯ : ২০০৭ সালের বাংলাদেশে ২৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সি নারীদের অর্ধেকের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল **১৫** বছর বয়সের মধ্যে। একই বয়সি নারীদের অর্ধেকের প্রথম সন্তান হয়েছে **১৮** বছর বয়সের মধ্যে। **১৫** বছর বয়স নাগাদ মা হয়েছে একটি বড় অংশ। (বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে, ২০০৭)

- বাল্যবিবাহ এ দেশে একটি বড় সমস্যা। এটা নিরোধের লক্ষ্যে করা আইনটি পুরোনো, কিন্তু তাতে পুরোপুরি কাজ হচ্ছে না। পারিবারিক আইনের সঙ্গে অসামঞ্জস্যের কারণে এ আইনের আওতাও এক অর্থে সীমিত হয়ে পড়ে।
- আইনটি বলছে, পুরুষেরা **২১** বছর বয়স এবং নারীরা **১৮** বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগে বিয়ে করতে পারবে না। এর কম বয়সি কোনো পুরুষ বা নারীর বিয়ে হলে তার অভিভাবক বা দায়ী প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের সাজা হবে। সাজা যৎসামান্য। তদুপরি ধর্মীয় বিধান মতে, বিয়ে একবার হয়ে গেলে সেটা জায়েজ থাকবে, বিবাহিতজনের বয়স যা-ই হোক না কেন। যেসব বিষয় ধর্মানুসারী পারিবারিক আইনে চলে, বিয়ে তার একটি। তবে বিয়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক এবং উল্লিখিত বয়সের আগে বিয়ে আইনত নিবন্ধিত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু নিবন্ধিত না হলেও বিয়ে গ্রহণযোগ্য থাকে।
- বাল্যবিবাহ বিষয়ে নজর রাখা এবং রিপোর্ট করা যেমন জরুরি, তেমনি বয়স ও আইনের জটিলতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার জন্য এটা একটা ভালো ক্ষেত্র।
  - প্রত্যন্ত, রক্ষণশীল এবং দারিদ্র্য-অধ্যুষিত এলাকায় বাড়তি নজর রাখা প্রয়োজন।

অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০ : এই আইনটিতে নাবালকের অভিভাবকত্ব-সংক্রান্ত বিধিবিধান আছে। এ আইনে নাবালকের বয়স ছেলে ও মেয়েভেদে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের মতো। এখানেও পারিবারিক আইনের কথা এসে পড়ে।

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ : জন্মনিবন্ধনের কাজ স্থানীয় সরকারের। এলাকাভেদে নিবন্ধক :

- ✓ সিটি করপোরেশনের মেয়র বা কমিশনার।

- ✓ পৌরসভার মেয়র, প্রশাসক বা কমিশনার।
- ✓ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।

- নিবন্ধন বইয়ের তথ্যের জন্য নির্ধারিত ফি দিয়ে নিবন্ধকের কাছে আবেদন করতে হয়। সে তথ্য নিবন্ধককে দিয়ে সত্যায়িত করিয়ে নিতে হয়।

- কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, জন্মনিবন্ধন এখনো যথেষ্ট প্রচলিত হয়নি। তা ছাড়া যাদের নিয়ে এখন ঘটনা ঘটছে, তাদের অনেকেরই হয়তো জন্ম নিবন্ধিত হয়নি। তাই জন্মনিবন্ধনের প্রসার ঘটাতেও প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে হবে। এ উদ্যোগ অন্য রিপোর্টারদের কাজে লাগবে। এমআরডিআই/ইউনিসেফের সমীক্ষায় দেখা গেছে, এ নিয়ে রিপোর্ট খুব কম হচ্ছে।

  - আইনটি বলছে, এখন থেকে পাসপোর্ট, বিয়ে, স্কুলে ভর্তি, সরকারি চাকরি, গাড়ি চালানোর লাইসেন্স, ভোটার হওয়া এবং জমির নিবন্ধন করতে জন্ম নিবন্ধনের প্রমাণপত্র লাগবে। এ বিধানের নানামাত্রিক তাৎপর্য ও লাভ সম্পর্কে রিপোর্ট হতে পারে।

নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০৯ : আইনটির এ সংশোধনীর ফলে এখন থেকে অবাংলাদেশি কোনো পুরুষের সঙ্গে বিবাহিত কোনো বাংলাদেশি নারীর সন্তান জন্মসূত্রে তার মায়ের, অর্থাৎ– বাংলাদেশি নাগরিকত্ব পাবে। এত দিন এ রকম বৈবাহিক সম্পর্কে জন্ম নেওয়া শিশুরা তাদের বাবার নাগরিকত্ব পেত, অর্থাৎ– তারা বাংলাদেশের নাগরিক হতে পারত না।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৭ (১), ১৮, ও ২৮ নম্বর অনুচ্ছেদ : দেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানের এ অনুচ্ছেদগুলোয় যথাক্রমে বলা হয়েছে–

- ✓ গণমুখী ও সর্বজনীন এবং আইন-নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সব শিশুর অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা নেবে।
- ✓ রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা নেবে জনগণের পুষ্টি ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য; মদ, মাদক ও স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজ ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জন্য; গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য।
- ✓ রাষ্ট্র কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, লিঙ্গ ইত্যাদি কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য করবে না এবং নারী, শিশু বা অনগ্রসর অংশের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে পারবে।

  - সংবিধানের এ বিধানগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিশুর কল্যাণের প্রতি রাষ্ট্রের অঙ্গীকারের কথা বলছে। এ অঙ্গীকারগুলো পূরণ করা হচ্ছে কি না, সেটা আপনার নজরদারির আওতায় অবশ্যই পড়বে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ৩১ ও ৩৯ নম্বর অনুচ্ছেদ : সংবিধানের এ অনুচ্ছেদগুলোয় নাগরিকদের এবং সংবাদমাধ্যমের এমন কিছু অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে, যা সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতার জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

- অনুচ্ছেদ ৩১-এ ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তি এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনযাপনের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আলাদা করে কোনো আইন না থাকলেও সংবিধানের এ অনুচ্ছেদ সেটার কথা বলছে।
- অনুচ্ছেদ ৩৯-এ নাগরিকদের (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং (২) বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার ও সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ধারায় বলা স্বাধীনতাগুলোর কিন্তু শর্ত আছে। বলা হয়েছে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের যুক্তিসংগত বাধানিষেধ সাপেক্ষে এ স্বাধীনতা থাকবে।

প্রেস কাউন্সিল আইন, ১৯৭৪ : সংক্ষুব্ধ নাগরিকেরা সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান প্রেস কাউন্সিলের কাছে সংবাদমাধ্যমের কোনো আচরণ বিষয়ে অভিযোগ করতে পারবেন। প্রেস কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমের মালিক/সম্পাদকসহ সাংবাদিককে ডেকে এর শুনানি করবে। তবে দায়ী সাব্যস্ত হলে সংবাদমাধ্যম বা সাংবাদিককে কেবল 'হুঁশিয়ার, ভর্ৎসনা বা তিরস্কার' করা যাবে। এ আইনটির লক্ষ্য বলা হয়েছে : বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ এবং সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার মান সংরক্ষণ ও উন্নয়ন। সাংবাদিকদের জন্য প্রেস কাউন্সিলের একটি আচরণবিধি রয়েছে।

দণ্ডবিধি, ১৮৬০ : দণ্ডবিধির যে ধারা দুটি সব সময় মনে রাখা জরুরি, তা হচ্ছে ধারা ৪৯৯ ও ৫০০। এতে কারো মানহানি বা সুনাম ক্ষুণ্ণ করে কোনো কিছু প্রকাশ করলে জেল-জরিমানার বিধান আছে। ধারা ৫০০, অর্থাৎ– সুনাম ক্ষুণ্ণ করার জন্য দুই বছর অব্দি জেল এবং/অথবা জরিমানা হতে পারে। এ ছাড়া, ধারা ২৯২, ২৯৩ ও ২৯৪-এ অশ্লীলতাসংক্রান্ত নিষেধ ও দণ্ডের কথা আছে। এগুলোর আওতায় পড়ছে–অশ্লীল প্রকাশনা, অল্পবয়সিদের কাছে (অনূর্ধ্ব-২০) অশ্লীল বস্তু বিক্রি এবং অশ্লীল আচরণ বা গান প্রদর্শন। ২৯৫(ক) ধারায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের দণ্ড– দুই বছর অব্দি জেল এবং/অথবা জরিমানার বিধান করা হয়েছে।

তাই এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, শিশুসংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিবেদন করতে গিয়ে আদালতের কোনো আদেশ অমান্য করলে এবং আদালত বা বিচারকের সুনাম ক্ষুণ্ণ করে, হেয় করে কিছু প্রকাশ করলে সেটা হবে আদালত অবমাননা। যা প্রকাশ করা হয়েছে সেটা যদি সত্যও হয়, তবু তা আদালতের অবমাননা বিবেচিত হবে। যেকোনো মামলার রিপোর্ট করার সময় সাংবাদিকদের খেয়াল রাখা প্রয়োজন, আদালতের কোনো বিশেষ নির্দেশনা আছে কি না। যেমন– মামলার বাদী, বিবাদী বা সাক্ষীদের সঙ্গে কথা বলা বা তাদের কোনো বক্তব্য প্রকাশ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকলে সেটা মানতে হবে।

("শিশু অধিকার সনদ ও প্রাসঙ্গিক জাতীয় আইন" লেখাটি কুররাতুল-আইন-তাহ্‌মিনার লেখা *'রিপোর্টারের জন্য নীতি-নৈতিকতা : প্রসঙ্গ শিশু'* বইটি থেকে নেয়া হয়েছে)

ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)

৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (৪র্থ তলা), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোন : +৮৮-০২-৯১৩৪৭১৭, +৮৮-০২-৯১৩৭১৪৭

ইমেইল : info@mrdibd.org, ওয়েবসাইট : www.mrdibd.org

/newsethicsandchildren